Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 349 - 355
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 349 - 355
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাঙালীর লোকায়ত জীবন : প্রসঙ্গ অনুবাদ সাহিত্য

নন্দ কুমার পাখিড়া
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়
কেন্দ্রাডঙ্গল, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID: nandakumar19800@gmail.com
ও
ড. সমরেশ মজুমদার
তত্ত্বাবধায়ক, বাংলা বিভাগ
সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়
কেন্দ্রাডঙ্গল, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
লোকসংস্কৃতি, উইলিয়াম থামস্, অনুবাদ সাহিত্য, পঞ্চামৃত, চতুবর্গলাভ, বড়ঠাকুর, জন্মান্তরবাদ।

Abstract

সংস্কৃতির সঙ্গে যখন 'লোক' শব্দটি জোড়া হয় তখন আমাদের তাত্ত্বিক মন সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মাত্রাগত বিশিষ্টতায় অনুসন্ধানী হয়ে ওঠে। এই লোকসংস্কৃতিরই নানা উপাদান হল লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য ইত্যাদি। লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে তা শিষ্ট সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এর বিপুল পরিচয় পাই। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতিতে লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার ইত্যাদি নানা লোক উপাদানের সন্ধান পাই। কৃত্তিবাস অনুদিত রামায়ণে, মালাধর বসু অনুদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে এবং কাশীরাম দাস অনুদিত মহাভারতে বহু লোকসংস্কারের বর্ণনা পাওয়া যায়। পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞের মাধ্যমে নারায়ণের অংশরূপে পুত্র রামচন্দ্রকে পাওয়া এই লোকবিশ্বাস পুরাণ থেকেই লোকসমাজে এসেছে। জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু নিয়ে বাঙালির নানা লোকসংস্কারের পরিচয় তিনটি অনুদিত কাব্যে আছে। রামচন্দ্রাদির জন্মের পর পাঁচুটি, ষষ্ঠীপূজা, আটকলাই ইত্যাদি বর্ণনা যেমন আছে তেমনি আবার পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহে স্ত্রী আচারের বর্ণনাও বাঙালির সংস্কারজাত। পাপ-পুণ্যের বিশ্বাসের ধারণাও ধরা পড়েছে কাশীদাসী মহাভারতে। জন্মান্তরবাদের প্রসঙ্গও এসেছে। মানুষের মৃত্যুর সময়কালে নারায়ণকে স্মরণ করা, মৃত আত্মার প্রতি যমদূতের কোনো অধিকার নাথাকা, মৃত্যুর পর পিণ্ডদানের রীতি এ ধরণের নানা লোকবিশ্বাসের সন্ধান রয়েছে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে। বাঙালি বহুদিন ধরে লোকজীবনে আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিকে লালন করে আসছে। আর তারই প্রতিফলন দেখতে পাই মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 349 - 355
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

সংস্কৃতি কি? লোকসংস্কৃতিই বা কি? এডওয়ার্ড টাইলার ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 'Culture' শব্দটি ব্যবহার করেন এবং সংস্কৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি আবার 'Culture' এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'কৃষ্টি' শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় 'Culture' এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি তাৎক্ষণিক ভাবে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়। সংস্কৃতি শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ থেকে জানা যায় সংস্কৃতি শব্দটি তৈরী হয়েছে সম – কৃ + তি থেকে, যা সম্যকরূপে গড়ে তোলে। আমরা এমন করে তাকে গড়ে তুলি যাতে ভালো কিছু সম্পাদিত হয়। উইলিয়াম কেরীর মতে, সংস্কৃতি হল একটি গোষ্ঠীতে পুরুষানুক্রমে তৈরী জীবন যাত্রার নানা ছক। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কৃতি বলতে যে সামগ্রিক নীতি আয়োজনকে বোঝায় তা হল প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশকে আয়ত্তে আনতে গেলে মানুষ যা কিছু উদ্ভাবন করছে, করে এবং করবে সেগুলি সম্পর্কে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম, এক গোষ্ঠী থেকে আর এক গোষ্ঠীতে প্রতিবেদিত অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে মানুষের নান্দনিক সমস্ত সৃষ্টি যা এই সব পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে অভিজ্ঞতাটির অনুষঙ্গে গড়ে ওঠে এবং হস্তান্তরিত হয় এবং সংস্কৃতির আয়তনকে সমৃদ্ধ করে। এই দুটি দিককে একত্রে সুসংহত করে তোলে প্রথা, আচার, রীতি, সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতি। পরস্পর সাপেক্ষে এই স্তরগুলির অস্তিত্ব লোকসমাজে ঐতিহ্যগতভাবে বিদ্যমান, এরাই একত্রে 'সংস্কৃতি' নামে অভিহিত হয়।

সংস্কৃতির সঙ্গে যখন 'লোক' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয় তখন আমাদের তাত্ত্বিক মন সংস্কৃতির সাথে লোকসংস্কৃতির মাত্রাগত বিশিষ্টতায় অনুসন্ধানী হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে প্রথম অনুসন্ধেয় বিষয় হল লোক বলতে আমরা কাদের বুঝি? ইংরাজী Folk শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলা 'লোক' শব্দটি সর্বসম্মত ভাবে স্বীকৃত। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের দার্শনিক উইলিয়াম থামস্ The Athenaeum পত্রিকায় লিখিত একটি পত্রে সর্বপ্রথম 'Folk Lore' শব্দটি ব্যবহার করেন। Folk Lore এর একাধিক প্রতিশব্দ পাওয়া গেলেও জনপ্রিয় হিসাবে লোকসংস্কৃতিই বহুল ব্যবহৃত। লোক বলতে সাধারণত People বা জনসাধারণকে বোঝায়। কিন্তু 'Folk Lore' এর 'লোক' বলতে সমস্ত মানুষকে না বুঝিয়ে বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষকে বোঝায়। পুরাতন ধারণায় গ্রামের কৃষিজীবি নিরক্ষর গোষ্ঠীবদ্ধ জনসাধারণ অর্থাৎ গ্রামীণ সংস্কৃতি, কিন্তু আধুনিক ধারণায় 'লোক' বলতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি কোনো সূত্রে যদি একাধিক মানুষ সংঘবদ্ধ হন তখন ঐ জনসাধারণকে বুঝি এবং এদের বিশ্বাস, সংস্কার, আচার–কেই লোকসংস্কৃতি বলি। আর লোকসংস্কৃতিরই নানা উপাদান হল – লোকসাহিত্য, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোককথা, লোকগীতি ইত্যাদি।

লোকসাহিত্য হল লোকসংস্কৃতির অন্যতম একটি শাখা। লোকপরম্পপরায় মুখে মুখে বাহিত হয়। পরে লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে লোকসাহিত্য শিষ্টসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে

> "লোকসাহিত্যের সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের পার্থক্য হল, লিখিত সাহিত্য কালক্রমে যেমন প্রাচীন (Classic) হয়ে যায়, লোকসাহিত্য তা হয় না। লোকসাহিত্য চির নবীন, প্রমত্ত, প্রমুক্ত ও সবুজ।"[১]

বাংলাদেশে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, লোকসাহিত্যের অভাব নেই। লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী, পাঁচালী ইত্যাদি বহুদিন ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের লোকসাহিত্যের বিপুল পরিচয় পাই। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য প্রভৃতিতে লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কারপ্রভৃতি নানা লোক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা হল অনুবাদ সাহিত্য। এ যুগের সাহিত্য বলতে মূলতঃ কাব্যসাহিত্যকেই বোঝায়। এ যুগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত দুটি মহাকাব্য–রামায়ণ ও মহাভারত এবং একটি পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। এই শাখায় কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী' মালাধর বসুর শ্রীকষ্ণবিজয় এবং কাশীরাম দাসের 'ভারত পাঁচালী' গুরুত্বপূর্ণস্থান দখল করে আছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রচলিত অনেক লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। গঙ্গা নদীর উৎপত্তির লোকবিশ্বাস এরকম–কপিল মুনির শাপে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র মারা গেলে সগরের নাতি অংশুমানকেমুনি বলেন –

> "মর্ত্যলোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার।
> তবে সে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার।।"[২]

কপিল মুনি গঙ্গার জন্ম সম্পর্কে আরও বললেন –

"দ্রবরূপ হইলেন নিজে চক্রপানি।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন পতিত পাবনী।।"[৩]

তাই পতিত পাবনী গঙ্গা আজও বাঙালি হিন্দুর ঘরে ঘরে পবিত্র জল হিসাবে পূজার্চনায় ব্যবহৃত। গঙ্গার পবিত্রতা সম্পর্কে এই লোকবিশ্বাস প্রাচীনকাল থেকে আজও পর্যন্ত রয়েছে। কবি কৃত্তিবাস বর্ণনা করেছেন –

"যে গঙ্গাসাগরে নর স্নান দান করে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে।।"[৪]

তাই এই লোকবিশ্বাস থেকে বর্তমান কালেও লক্ষ লক্ষ মানুষ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ডুব দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতে যান। রাজা দশরথের পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞের মাধ্যমে পুত্রসন্তান হিসাবে নারায়ণের অংশরূপে রামচন্দ্রকে পাওয়া এই লোকবিশ্বাস পুরাণ থেকেই লোকসমাজে এসেছে।

> "হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায় জন্ম-পূর্ব সময় থেকে বিবাহ পর্যন্ত নানা কৃত্যে জাতকের মঙ্গলকামনা জানানো হচ্ছে। এগুলি 'দশ সংস্কার' নামে প্রচলিত।"[৫]

গর্ভাধান, পুংসবণ ও সীমন্তোন্নয়ন এগুলি জন্ম–পূর্ববর্তী লোকসংস্কার। গর্ভাধানের পর চতুর্থমাসে সীমন্তোন্নয়ন হয়। আবার সুস্থ, সবল, সুন্দর, সন্তান কামনায় লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার অনুযায়ী গর্ভবতীকে পঞ্চম মাসে গর্ভশোধনের জন্য পঞ্চামৃত সেবন করানো হয়। এই পাঁচটি বস্তু হল – ঘৃত, মধু, চিনি, দধি ও দুগ্ধ।

"পঞ্চামৃত দিয়া কৈল গর্ভের শোধন।"[৬]

ষষ্ঠ মাসে পরমান্ন ভোজন, সপ্তমমাসে সাধভক্ষণ ও নবমমাসে নতুন বস্ত্র পরিধানের কথাও রামায়ণে পাওয়া যায়। লোকসংস্কার অনুসারে দশরথের চারপুত্র জন্মের পর পাঁচদিনে পাঁচুটী, ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা, আটদিনে অষ্টকলাই, তেরোদিনে অশৌচান্ত এবং ছয়মাসে অন্নপ্রাশনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলায় হিন্দু লোকসংস্কারের এই চিত্র আজও দেখা যায়। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন ষষ্ঠীপূজার দিন নবজাতকের ভাগ্য লেখা হয়। তাই তার মাথার পাশে কলম রেখে দেওয়া হয়। অষ্টকলাই এরদিন শিশুর মঙ্গল কামনায় ছোলা, মুগ, মটর, খেসারী, বিরি, চিড়া, মুড়ি ও খই – এই আট রকম ভাজা দিয়ে আটকলাই প্রস্তুত করে প্রতিবেশীদের খাওয়ানো হয়। এই সংস্কার গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে এখনও রয়েছে। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে এই নিত্য সংস্কারগুলি তুলে ধরেছেন –

"একৈক গণনে যে হইল চারিদিন।
পাঁচদিনে পাঁচুটী করিল সুপ্রবীণ।।
ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি জাগরণে।
দিল অষ্টকলাই অষ্টাহে শিশুগণে।।

ত্রয়োদশে রাজার হইল অশৌচান্ত।
কতেক করিল দান তার নাই অন্ত।।
ছয়মাস বয়স্ক হইল চারিজন।
করাইল সবাকার ওদন প্রাশন।।"[৭]

বাঙালির জীবনকেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, রীতি ও প্রথা কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে। চার ভাইয়ের বিবাহের সংস্কারে দেখা যায়, বিবাহিত জীবন যাতে আনন্দে, সুখ–স্বাচ্ছন্দে ভরে থাকে সেজন্য শুভলগ্ন ও তিথি দেখে নেওয়ার রীতি ছিল।

"কহিতে লাগিল রাজা জনক তখন।
সীতার বিবাহলগ্ন কর শুভক্ষণ।।"[৮]

বিবাহের সময় বর ও কনের গায়ে হলুদ লাগানোও বিবাহের একটি মূল সংস্কার।

"হরিদ্রা মাখায় চারি বরে কুতূহলে।
অঙ্গেতে পিঠালী দিল সখীরা সকলে।।"[৯]

'শ্রীরাম পাঁচালীতে' উত্তরাকাণ্ডে লক্ষণের সঙ্গে গমনকালে সীতা দেবী পথে নানা অমঙ্গল চিহ্ন দেখে ভয়ে বলেছেন –

"বামেতে দেখেন সর্প শৃগাল দক্ষিণে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 349 - 355
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অমঙ্গল দেখি সীতা কহেন লক্ষণে।।
লক্ষণ অশুভ নানা কেন দেখি পথে।।
না যাব অযোধ্যা ফিরে হেন লয় চিতে।।”[১০]

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার থেকে উঠে আসা চিরন্তন কিছু কথা যা প্রবাদে পরিণত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। লোকসমাজের মধ্যে বসবাসকারী সাধারণ লোকেরাই পূজা – অর্চনা, বিবাহ, ব্রত প্রভৃতি ক্ষেত্রে যা যা রীতি মেনে চলেন তাই বিশ্বাস ও সংস্কার। কৃত্তিবাসের রামায়ণে সে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ব্যক্ত হয়েছে।

মধ্যযুগে বাংলা মহাভারতের অনুবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন কাশীরাম দাস। কবির ‘ভারত পাঁচালী’ কাব্যেও লোকায়ত সংস্কার ও বিশ্বাসের ছবি ধরা পড়েছে। বাঙালির বংশ বিনাশ হওয়ার সে চিরকালীন ভীতি তা দেখতে পাওয়া যায় আদি পর্বের জরৎকারুর উপাখ্যান অংশে। জরৎকারুর পিতৃগণ বলেছেন –

“যাযাবর বংশে আমা সবার উৎপত্তি।
নির্বংশ হইনু তেঁই হৈল হেন গতি।।”[১১]

এই নির্বংশ হওয়ার হাত থেকে বংশকে রক্ষা করার জন্যে পিতৃগণ বললেন –

“বিভা করি জরৎকারু জন্মাও সন্ততি।
সন্তান জন্মিলে হবে বংশের সদ্গতি।।”[১২]

বাঙালির বংশ বিস্তারের এ সংস্কার চিরকালের। আবার শাপ-শাপান্ত নিয়েও বাঙালির ভীতি বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। বাসুকি নাগ বলেছেন –

“সবে ভ্রাতৃগণ লয়ে করেন যুকতি।
মায়ের শাপেতে ভাই না দেখি নিষ্কৃতি।।
জনকেরশাপেতে আছয়ে প্রতিকার।
জননীর শাপে নাহি দেখি যে উদ্ধার।।”[১৩]

জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু নিয়ে বাঙালির অজস্র লোকবিশ্বাস, সংস্কার ও লোকাচার রয়েছে। মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়াদি বাঙালির সমাজ জীবনের একটি বড় ব্যাপার। এর পরিচয়ও আমরা বাঙালি কবি কাশীরাম দাসের মহাভারতে পাই। তক্ষক নাগের দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হলে –

“অন্তঃপুরে শুনিয়া কান্দয়ে সর্বজন।
প্রেতকর্ম করিল রাজার ততক্ষণ।।
অগ্নিহোত্র ঘৃতে তনু করিল দাহন।
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল তাঁর বিহিত লক্ষণ।।”[১৪]

ভাগ্য গণনাও জ্যোতিষবিদ্যা নিয়েও বাঙালির লোকবিশ্বাস রয়েছে। ব্যাসদেব জনমেজয়কে বলেছেন –

“ভবিষ্যৎ খণ্ডন না হয় কদাচন।।
তোমার পিতার জন্ম হইল যখন
গনিয়া কহিল যত শাস্ত্র বিজ্ঞজন।।”[১৫]

বাঙালির চতুবর্গ লাভের চিরকালীন বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে ‘ভারত পাঁচালী’তে –

“ইহলোকে আয়ুর্যশঅন্তে স্বর্গে যায়।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বগ পায়।।”[১৬]

বিবাহ রীতি নিয়েও বাঙালির যে সংস্কার তার পরিচয় আছে আদিপর্বে, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ অংশে -

“পঞ্চভায়ে বসাইল পঞ্চ সিংহাসনে।
হরিদ্রা পিটালি গন্ধ দিল প্রতিজনে।।
পঞ্চতীর্থ জল আনি স্নান করাইল।”[১৭]

আবার –

“সিংহাসনে বসাইল দ্রৌপদী সুন্দরী।
পঞ্চভাই সাতবার প্রদক্ষিণ করি।।”[১৮]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 349 - 355
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাঙালি পরিবারে সন্তান জন্মের পর জাতকর্ম ক্রিয়াদি ও নামকরণের সংস্কার তারও সন্ধান পাই সভাপর্বে। -

"জাতকর্ম বিধিমত করিল রাজন।
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ।।"[১৯]

শনি দেবতার কোপে পড়ার বিশ্বাস বাঙালির চিরন্তন। তাই ভয়ে বাঙালি তাঁকে 'বড়ঠাকুর' বলে ডাকে, নাম নিতেও ভয় পায়। বনপর্বে শ্রীবৎস রাজা কীভাবে শনিদেবের কোপে পড়েছিলেন তার বর্ণনা আছে মহাভারতে –

"ধূমকেতু খসি পড়ে অতি অমঙ্গল।।
শনি কোপানলেতে পড়িল নৃপবর।
রাজ্যরক্ষা নাহি হয় উৎপাত বিস্তার।।"[২০]

মৃত্যুর পর স্বজনের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান বাঙালির একটি গভীর লোকবিশ্বাস ও সংস্কারে পর্যবসিত, মহাভারতে তার সন্ধান পাই। বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে যখন চার ভাই মারা গেছে তখন যুধিষ্ঠির তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং কথামতো যে-কোন এক ভাইকে জীবিত করতে চেয়েছেন। তিনি বকরূপী ধর্মের কাছে সহদেবের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বলেছেন। তখন ধর্মরাজ প্রশ্ন করেছেন অন্য ভাইদের কেন যুধিষ্ঠির বাঁচাতে চাইলেন না। তার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছেন –

"আমা হতে পিণ্ড পাবে মম পিতৃগণ।।
মম মাতামহগণ তারা পিণ্ড পাবে।
নকুলের মাতামহে কে বা পিণ্ড দিবে।।
সহদেব প্রাণ পেলে ধর্মরক্ষা পায়।
নতুবা পরম ধর্ম একেবারে যায়।।"[২১]

তিথি-নক্ষত্র মেনে কোন কাজ করার সংস্কার বাঙালি জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভীষ্মপর্বে দেখি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর তিথি কবি বলেছেন –

"মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী যে তিথি।
মঘা নামে নক্ষত্রেতে সাজে নরপতি।।
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব প্রচণ্ড।
কুরুক্ষেত্রে রহে জুড়ি সর্ব পূর্বখণ্ড।।"[২২]

বাঙালির পাপ-পূণ্যবোধের বিশ্বাসও ধরা পড়েছে মহাভারতে। অর্জুন কৃষ্ণকে বলেছেন –

"গোত্রবধে মহাপাপ হইবে নিশ্চয়।
রাজ্যলোভে কোন হেতু পাপের সঞ্চয়।।"[২৩]

অথবা, স্ত্রীপর্বে শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন-

"অবশ্য আছয়ে পাপ-পুণ্যের উদয়।
আপনি জানহ তাহা ওহে মহাশয়।।"[২৪]

কর্ম অনুসারে মানুষ জন্মলাভ এবং মোক্ষ লাভ করে এ বিশ্বাসওবাঙালির বহু প্রাচীন –

"পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্মায়।
আপনার কর্মফলে সব হয় ক্ষয়।।
কর্মফলেযাতায়াত করে সব জন।
যাহার যেমন কর্ম পায় সে তেমন।।"[২৫]

বাঙালি বিধাতার লিখনকেও লোকবিশ্বাস থেকে আত্মগত করে নিয়েছে। যার পরিচয় মহাভারতে মেলে।

"অনিত্য শরীর এই শুনহ রাজন।
বিধাতা লিখিল যারে যেমত প্রকারে।
খণ্ডন না যায় তাহা জনমিলে মরে।।"[২৬]

জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গেও বাঙালির বিশ্বাস রয়েছে –

"কুম্ভকার-চক্র যেন পাক দিয়া ফিরে।

তেনমত জন্ম মৃত্যু পাক দিয়া ঘুরে।।”[২৭]

অথবা,

“পুনর্জন্ম হৈল তাঁর ব্রাহ্মণের ঘরে।
জাতিস্মর হইল ভরত নাম ধরে।।”[২৮]

বাঙালি পূজার্চনায় বিভিন্ন আচার ও সংস্কার পালন করে। তারই মধ্যে অন্যতম হল পঞ্চামৃত ও কলা। এর পরিচয়ও আমরা বাঙালি কবির কাছ থেকে পাই –

“পুরোহিত দ্বিজগণ পূজে বিধিমতে।
দধি দুগ্ধ চিনি মধু রম্ভা আর ঘৃতে।।”[২৯]

এভাবে কাশীদাসী মহাভারতে ছড়িয়ে রয়েছে বাঙালির বহু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের কথা।

মধ্যযুগে একটি পুরাণেরও বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবি মালাধর বসু ভাগবত পুরাণের অনুবাদ করেন। তাঁর কাব্যের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্য। যদিও এ কাব্যটি তত্ত্বও নীতি কথায় পরিপূর্ণ তবুও কিছু-কিছু লোকসংস্কারের পরিচয় এ কাব্যে মেলে। কবিকাব্যে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করেছেন যা বাঙালির লোকবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। যেমন– ‘নির্ধন পুরুষের ভয় নাহিক সংসারে’, কিংবা ‘জননী জঠের দুঃখ না যায় খণ্ডন’ ইত্যাদি। জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু এই তিনটি সংস্কারের বর্ণনা এ কাব্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া জ্যোতিষ গণনায় বিশ্বাসও ছিল। কৃষ্ণের জন্মলগ্ন বর্ণনায় জ্যোতিষ শাস্ত্রসম্মত লগ্ন-রাশি-নক্ষত্রের উল্লেখ কবি করেছেন। আবার অপদেবতাদের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য স্বর্গ-গঙ্গাজল দিয়ে রক্ষামন্ত্র বাঁধার রীতি বিশ্বাসও ছিল। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কবি বিবাহ পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন। অনেক প্রকার বিবাহের কথা কবি বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের সময় লক্ষণা দেবী সাতপাকে ঘোরে, বাঙালির এ রীতিও উল্লেখিত আছে। মানুষের মৃত্যুর সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করলে কোটি জন্মের পাপ দরীভূত হয়। মৃত আত্মার প্রতি যমদূতের কোন অধিকার থাকে না – এ ধরণের নানা প্রচলিত লোকবিশ্বাস এ কাব্যে আছে। মৃত্যুর পর পিণ্ডদানের রীতির কথাও বলা হয়েছে –

“পিণ্ডদান তর্পণ কৈল সমুদ্রের জলে।।”[৩০]

গৃহ নির্মাণেও বাংলাদেশের রীতি – পদ্ধতি ও সংস্কারের পরিচয় পাই।

“বিচিত্র চৌখণ্ডি ঘর দেখিতে সুন্দর।
… … …
চতুঃসালা-চতুষ্পথ কইল ঠাঞ্চী ঠাঞ্চী।।”[৩১]

উৎসব-অনুষ্ঠানে গৃহদ্বারে কলা গাছ স্থাপন করা হত। বিখ্যাত সমালোচক বলেছেন –

> “পরদারগমন, স্ত্রীবধ, নারীহত্যা সেকালে চরম নিষ্ঠুরতা ও পাপকর্ম বলে বিবেচিত হত। ‘স্ত্রীবধিয়া’ অপবাদ সবচেয়ে নিন্দনীয় ছিল। ভাদ্রমাসে চতুর্থীর চাঁদ দর্শন করলে মিথ্যা কলঙ্ক হয় এই রকম বিশ্বাস জনমানসে বদ্ধমূল ছিল। …স্ত্রীলোকের বাম উরু, বাম নেত্র এবং বাম বাহু স্পন্দন সৌভাগ্যের সূচনা করত।”[৩২]

উল্কাপাত, কুকুরের কান্না প্রভৃতি যে অশুভলক্ষণ বা অমঙ্গল সূচক বাঙালির সে বিশ্বাসের পরিচয়ও এ কাব্যে আছে। আবার অশুভ প্রতিকারের জন্য তীর্থ ভ্রমণের কথাও পাওয়া যায়।

বিশ্বাস-সংস্কারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ব্যবহারিক যে প্রয়োগ তাই-ই হোল আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি। যা বাঙালি বহুদিন ধরে তার সমাজ জীবনে লালন করে আসছে। আর তারই প্রতিফলন দেখতে পাই অনুবাদ সাহিত্যে।

> “বিশ্বাস সংস্কার হল মানুষের সভ্যতার আদিস্তর থেকে মানুষের মনের মধ্যে বাহিত কতকগুলো ধারনা।”[৩৩]

অনুবাদ সাহিত্যের আনাচে-কানাচে সেই লোকধারণা বা বিশ্বাস ও লোকসংস্কার ধরা পড়েছে। প্রত্যেক কবিই বাঙালি, তাই তাঁরা তাঁদের কাব্যে বাঙালি সমাজকেই ব্যক্ত করেছেন।

Reference:

১. আচার্য্য, ড. দেবেশকুমার, প্রবন্ধ বিচিত্রা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বামা পুস্তকালয়, পৃ. ২০৮

২. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ, রামায়ণ, চতুর্থমুদ্রণ, সাহিত্যসংসদ, পৃ. ১৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 349 - 355
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. তদেব, পৃ. ১৫
৪. তদেব, পৃ. ২৩
৫. নস্কর, সনৎকুমার, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যঃ পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা, প্রথম প্রকাশ, দিয়া পাবলিকেশন, পৃ. ৩৫৪
৬. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ, রামায়ণ, চতুর্থমুদ্রণ, সাহিত্যসংসদ, পৃ. ৫২
৭. তদেব, পৃ. ৫৬
৮. তদেব, পৃ. ৭৭
৯. তদেব, পৃ. ৭৮
১০. তদেব, পৃ. ৪৮৪
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, কাশীদাসী মহাভারত, কাশীখণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্যসংসদ, পৃ. ৮
১২. মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ, রামায়ণ, চতুর্থমুদ্রণ, সাহিত্যসংসদ, পৃ. ৮
১৩. তদেব, পৃ. ২৭
১৪. তদেব, পৃ. ৩১
১৫. তদেব, পৃ. ৪৪
১৬. তদেব, পৃ. ৪৬
১৭. তদেব, পৃ. ১৯৫
১৮. তদেব, পৃ. ১৯৫
১৯. তদেব, পৃ. ২৫৮
২০. তদেব, পৃ. ৩৫৪
২১. তদেব, পৃ. ৫২১
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, কাশীদাসী মহাভারত, উত্তর কাশীখণ্ড, প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যসংসদ, পৃ. ৭০
২৩. তদেব, পৃ. ৭৪
২৪. তদেব, পৃ. ২৮২
২৫. তদেব, পৃ. ৭৪
২৬. তদেব, পৃ. ৩০৪
২৭. তদেব, পৃ. ৩১৪
২৮. তদেব, পৃ. ৩১৭
২৯. তদেব, পৃ. ৩১৮
৩০. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও রানা, সুমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চতুর্থ সংস্করণ, রত্নাবলী, পৃ. ১১৭
৩১. তদেব, পৃ. ১১৮
৩২. তদেব, পৃ. ১১৯
৩৩. গিরি, ড. সত্যবতী ও মজুমদার ড. সমরেশ, প্রথমখণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, রত্নাবলী, পৃ. ১০৫